নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ৭৩-৮২
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ক্ষমতায়ন ঃ অর্থনীতি, রাজনীতি ও বাস্তবতা

এস, এম, নুরুল আলম*

ক্ষমতায়ন ধারণার উৎপত্তি ও ব্যবহার

উন্নয়র রিটোরিকে ক্ষমতায়ন শব্দটি আজ আর কারও কাছে অজানা নয়। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত আলোচিত এবং বিতর্কিত প্রত্যয়ও বটে। আজকাল বহু ধরনের ক্ষমতায়নের কথা শোনা যায়। যেমন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক ক্ষমতায়ন, দরিদ্রের ক্ষমতায়ন কিংবা বলা হয় 'উপর থেকে নীচে' ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। ধরে নেয়া হয় ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অনেক বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব । যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক অংশগ্রহণ, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ কিংবা বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি। ক্ষমতায়ন ধারণাটি ব্যবহার করেন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, উন্নয়ন কর্মী, আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা (যেমন, বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইউএসএইড) এবং আরও অনেকে । এদের প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব মতাদর্শ, রাজনীতি ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্ষমতায়ন ধারনাটি বাবহার করেন।

যারা ক্ষমতায়ন শব্দটি ব্যবহার করেন তারা ধরে নেন যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীতে একটি বিরাট অংশ রয়েছে যারা নিঃস্ব, দরিদ্র, সম্পদ নেই, আয় কম কিংবা ইচ্ছে থাকলেও কাজের সুযোগ কম।আরও ধারণা করা হয় জনগোষ্ঠীতে একাংশ আছে যারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহনের সুযোগ কিংবা আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের পুষিয়ে দিতে হবে। এতে জনগোষ্ঠীর একাংশ ক্ষমতায়িত হয়, আর এটাকেই বলা হয় 'ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া'।

ক্ষমতায়ন ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন Paulo Freire (1972)। তবে উন্নয়ন ডিসকোর্সে এর ব্যবহার হচ্ছে প্রায় দুই তিন দশক যাবত। ক্ষমতায়নের মধ্যে গ্রোথিত রয়েছে অংশগ্রহণ ও সাম্যতার ধারণাগুলো। এটি উন্নয়ন ডিসকোর্সে সংপৃক্ত হয়েছে কারণ গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে হয়েছে অনুন্নয়ন। যদিও 'গরীব' ও অ-পশ্চিমা দেশগুলোতে বহুবিদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু এ স্বত্ত্বেও এ দেশগুলোতে দারিদ্রতা বেড়েছে, সালে সালে আয়ের বৈষম্য ও অর্নৈতিক শোষণ, কমেছে কৃষি উৎপাদন আর বিপর্যস্ত হয়েছে পরিবেশ। পশ্চিম তাড়িত মূল ধারা উন্নয়ন ডিসকোর্স ছিল একটি চাপানো ডিসকোর্স যেখানে অপশ্চিমা দেশগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক

---

* অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি। মূলধারা উন্নয়ন ডিসকোর্সে অশঅর্থনৈতিক উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করে উন্নয়নকে শুধু অর্থনৈতিক নির্মাণ হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন যে একটি 'সাংস্কৃতিক নির্মাণ' এবং এর যে একটি 'মানবিক তাৎপর্য' আছে তা অনুধাবন করা হয়নি।

মূলধারা উন্নয়ণ ডিসকোর্সে অশঅর্থনৈতিক উপাদান গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না যদিও সাম্প্রতিকালে এ ভাবনায় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে সাংস্কৃতিক প্রাকাধিকার (cultural endowment) উন্নয়নে বাধা এবং অনেক সময় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু উন্নয়ন লিটারেটরে সাংস্কৃতির প্রাক-অধিকারকে সর্বদাই প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বাধা হিসেবে দেখান হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ যেমন, মূল্যবোধ, পরিবার কাঠামো, ধর্ম, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, ভূমি বাবস্থা, স্থানিক-জ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়গুলো কোন সময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনাকরা হয় না। কিন্তু যুদ্ধত্তোরকালে কিছু উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ যেমন, গিউনার মিডরেল, ইর্ভাট হেগেন, ইর্মা এডেলম্যান, বার্ট হোসেলট্জ, পি, টি, বোয়ের উন্নয়নে অ-অর্থনৈতিক উপাদান ও সংস্কৃতির ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এই অর্থনীতিবিদগণ ইতিহাস, দর্শন, নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে মত দেন যে সাংস্কৃতিক প্রাক-অধিকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে (Ruttan 1986)।

এখানে ২/১টি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, জাপানে গ্রাম সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ দায়বদ্ধতা যৌথভাবে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষনে সহায়তা করেছে। এজন্যে কম খরচে পল্লী উন্নয়ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এ তুলনায় সে সকল দেশে ঐতিহ্যবাহী এ সাংস্কৃতিক উপাদানটি অনুপস্থিত, সেখানে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যয়বহুল হয়েছে। কুসুম নায়ার ভারতের সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, বীজ-সার-সেচ ভিত্তিক প্রযুক্তিতে কৃষকের অংশগ্রহণ ও সাড়া ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই ভিন্নতার কারণ হিসেবে আংশিকভাবে এই প্রযুক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের অিন্নতার কথা বলা হয়। জর্জ ফোষ্টার মেকসিকাশ একটি কৃষক সমাজ সম্পর্কে বলেছেন যে কৃষক সমাজ নতুন প্রযুক্তি বা নতুন কিছু গ্রহণ বা বর্জনে তাদের সার্বিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হন। এই সমাজে কৃষকরা মনে করেন যে জবিনের যা কিছু বাঞ্চিত যেমন, জমি, সম্পদ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সম্মান, ক্ষমতা, প্রভাব, নিরাপত্তা ইত্যাদি সবকিছুই সীমাবদ্ধ ও অপ্রতুল।

কেইথ গ্রিফিন ও এ, আর, খান এশিয়ার ৭টি রাষ্ট্রে দারিদ্র্যের উপর গবেষণা চালান । তারা গবেষণা থেকে এই উপসংহারে পৌঁছান যে, দারিদ্র্যের সমস্যা প্রবৃদ্ধির সমস্যা নয় বরং এটি অর্থনীতির একটি কাঠামোগত সমস্যা। গবেষকদ্বয় মত প্রকাশ করেন যে, দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বে এ সমস্যাটির তাৎপর্য ও পরিধি নিবিড়ভাবে বুঝতে হবে যা মূলধারাঅর্থনৈতিক মডেলে এ যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি। একটি গ্রহণযোগ্য ও

বাস্তবসম্মত দারিদ্র্যের মডেল সকল কার্যকারণ উপাদনগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে হবে। তাছাড়া এ ধরনের একটি কর্মসূচীর রূপরেখা কি হবে এবং সম্ভাব্য পলাপল কি হবে তারও একটি দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। গ্রিফিন ও খানের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে দারিদ্র্য নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সাথে জড়িত কিন্তু পশ্চিমা দারিদ্র্য বিমোচন মডেল সব সময় 'শ্রেণীহীন সমাজ' এই পূর্বানুমান থেকে তৈরী করা হয় (Griffin and Khan 1982)।

এ কারণে স্বীকার করে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ যে সমাজে শ্রেণীবিভক্তি রয়েছে এবং তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী । রাষ্ট্র শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। কারণ রাষ্ট্র যারা চালায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের দখলে তাদের নিজেদের স্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থ সব সময়ই প্রাধান্য পাবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের যে কোন কর্মসূচীতে এর প্রভাব লাকবে এটাই স্বাভাবিক। দারিদ্র্য সমস্যাটি একটি শ্রেণী সমস্যা। যতদিন পর্যন্ত দারিদ্রতা মডেল ও দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচীতে এ সত্যটির যথাযথ প্রতিফলন না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বাড়বে, এবং সমস্যা থেকে যাবে।

উন্নয়ন ডিসকোর্সের এই সীমাবদ্ধতার ও অসারতার কারণে ৫০ ও ৬০ দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে ৭০ ও ৮০ দশকে উন্নয়ন কৌশলকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়াস চালানো হয়। এই সময় সংযোজিত হয় অনেক চিত্তাকর্ষক কৌশল যা উন্নয়ন রিটোরিককে সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে তা কতটুকু কল্যাণ এনেছে এ নিয়ে প্রশ্ন করবার অবকাশ আছে।

উন্নয়নকে আরও 'গণমুখী' ও 'কার্যকরী' করার জন্যে জনগনের 'অংশগ্রহনের' কথা বলা হল। উন্নয়ন পদাবলীতে সংযোজিত হল 'অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনার ধারণা' শুনা গেল 'নীচ থেকে উপরে' বা 'তৃণমূল পরিকল্পনার' কথা । স্থানীক জ্ঞানের বিষয়টি নতুনভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। সাথে সাথে ক্ষমতায়ণ একটি প্রভাবশালী ধারণা হিসেবে ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব পায়। বলা যে পারে ক্ষমতায়ণ প্রকৃত প্রস্তাবে নতুন কিছু নয় এটি উন্নয়ন ডিসকোর্সে সংযোজিত হয়েছে মূলধারা উন্নয়নকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এটি মূলধারা উন্নয়ন প্রবক্তাদের পুরানো কৌশল নতুন আদলে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও কাঠামো

এ প্রবন্ধে ক্ষমতায়ন ধারণার বিভিন্ন অর্থ ব্যাখার প্রয়াস চালানো হবে। এ শব্দটির প্রকৃত ও ব্যবহৃত অর্থ কি, কারা বাবহার করছে এ ধারণাটি এবং কেন করছে ইত্যাদি বিষয় গুলো এ প্রবন্ধে বাখ্যা করা হবে । অবশ্যি প্রবন্ধের সূচনায় এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। এ প্রবন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য হল যে ক্ষমতায়ন কোন শ্রেণী নিরপেক্ষ ধারণা নয়। এই ধারণার মধ্যে গ্রোথিত রয়েছে দমতার সম্পর্ক যা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতাশালীদের অবস্থানকেই সুদৃঢ় করেছে। সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে দরিদ্র বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের অন্যতম পন্থা হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে । 'ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন' এটা

কতটুকু কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে করা হবে।

ক্ষমতায়নঃ একটি অসম প্রক্রিয়া

প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রোথিত রয়েছে দেয়া আর নেয়ার ব্যাপারটি। এটি একটি অসম সম্পর্ক ও প্রক্রিয়া নির্দেশ করছে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় কারও আছে (অর্থ্যৎ সরকার, ধনী জনগোষ্ঠী, এনজিও, আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা) আর কারও নেই (অর্থাৎ ভূমিহনি, দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলা, দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সুতরাং এখানে এক গোষ্ঠী যারা ক্ষমতাবান তারা আছে দেয়ার দলে আর অন্য গোষ্ঠী যারা দরিদ্র তারা হল ক্ষমতা প্রাপ্ত। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতাকে, তাদের উদ্যোগ, প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতাকে খাটো করে দেখা হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠালব্দ জ্ঞান এ প্রক্রিয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। সকল মানুষেরই জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছে, অনিচ্ছা, পছন্দ ও অপছন্দ আছে। ক্ষমতায়ন জনগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট ও ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস মাত্র। এ প্রসঙ্গে শ্রীলংকান সমাজ কর্ম Menike (1993)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ প্রবন্ধের লেখকের অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ:

> দ্রুত ক্ষমতায়নের পথে উত্তোরনের তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় এটা যে কেবল অবাস্তবই হবে না আত্মহানিকরও হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে নিজস্ব ছন্দ ও গতি আছে। এই ছন্দের উৎপত্তি হল তাদের নিজস্ব জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা। কোন শহর বা মহানগরীর পাথার নীচে অফিসে বসে এর উদ্ভবনের প্রয়োজন নেই। দরিদ্ররা জানে তারা কিভাবে ক্ষমতায়িত হবে।

Menike আরও লিখেছেন, 'যারা ক্ষমতায়নের জন্যে পরিকল্পনা করেন তারা আমাদের বাস্তবতা, আমাদের অগ্রাধিকার, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা-চেতনা, আমাদের প্রয়োজন ও সীমাবদ্ধতার কথা বুঝেন না' (পূর্বোক্ত)।

তাই বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে ক্ষমতায়ণ এক ধরণের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্ত পছন্দের পরিপন্থী। বলা চলে যে ক্ষমতায়ন: উপর থেকে আরোপিত ধারণা; একটি অসম সম্পর্ক নির্দেশ করে; মূলত অর্থনীতির ধারণা তাড়িত; শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়; ক্ষমতা নিরপেক্ষ নয়;. বাস্তবে এক ধরনের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে; মুক্ত পছন্দের পরিপন্থী; একটি দাতা-গোষ্ঠী তাড়িত উন্নয়ন পদ।

ক্ষমতায়নের স্বরূপ ও ব্যপ্তি অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন পরিমাপের জন্যে অনেক নির্দেশক (indicator) ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ব্যপ্তি কতটুকু হল তা বুঝান হয়। তবে দমতায়ন শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়কে ঘিরে। বলা হয় ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ করে দেয়া যায়। এ ফলশ্রুতিতে মেয়েরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হবে। এ

বিষয়ে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে ক্ষমতায়নের কয়েকটি নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ (Hashemi and Schuler 1996)ঃ ১. গতিশীলতাঃ মহিলাদের বাড়ীর আঙ্গিনার বাইরে বাজারে সিনেমা দেখতে কিংবা চিকিৎসার জন্যে কতটুকু যেতে সক্ষম কিংবা বর্তমানে যাওয়া আশা করছে কিনা। ২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তাঃ বাড়ী কিংবা বসত বাটির মালিকানা। ৩. ক্ষুদ্র ক্রয়ের ক্ষমতাঃ পরিবারের খাদ্য তৈরীর জন্য অল্প সল্প জিনিসপত্র ক্রয়ের স্বাধীনতা এবং বর্তমানে এটা কতটুকু করতে পারছে। ৪. বড় ক্রয়ের ক্ষমতাঃ ছেলেমেয়েদের কাপড় চোপড়, নিজের শাড়ী কাপড়, বাসনকোষন, গয়না-পত্র ইত্যাদি ক্রয়ের স্বাধীনতা। ৫. বড় সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণঃ বাড়ী ও জমি ক্রয়-বিক্রয়, বাড়ী ঠিক করা ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে অংশগ্রহণ। ৬. পারিবারিক আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা। ৭. রাজনৈতিক ও গণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণ ও প্রচারনা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে যে, ক্ষমতায়ন কি কতগুলো দৃশ্যমান নির্দেশকের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়?

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নঃ কিভাবে এবং কোথায়?

বাংলাদেশ ও পৃথিবীর আরও বহুদেশের দারিদ্র বিমোচন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র ঋণ একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ঋণকে 'মানুষের অধিকার' হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তি দেখানো হয় যে বন্ধক বিহীন স্বল্প পরিমানে ঋণ মানুষের দরজার গোড়ায় পৌছিয়ে দিলে তা মানুষ ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হবে, দারিদ্র সীমা ডিঙ্গাতে পারবে, আয় বাড়বে এতে দারিদ্র বহুলাংশে ঘুচিয়ে যাবে।

আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণের পথিকৃত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে গ্রামীণ ব্যাংক। পরবর্তীতে বহু এন, জিও ও সরকারী সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনে অংশ নেয়। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যতা সমগ্র বিশ্বে আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীর ২০টিরও বেশী দেশে গ্রামীণের অনুকরনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু হয়। গ্রামীণ ব্যাংক এই পর্যন্ত ১১,০০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে ২০০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বর্তমানে গ্রামীণ সদস্যের সংখ্যা ২৪ লক্ষ যার মধ্যে ৯০ শতাংশ হল মহিলা (ইউনুস ১৯৯৮)। অন্যদিকে বাংলাদেশের এনজিও গুলো ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৩৯৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল এর মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতা ছিলেন ৮১ শতাংশ আর পুরুষ ১৯ শতাংশ (CDF 1997)। তাই বলা যায় আশির দশকের শুরুতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে তা বর্তমানে বাংলাদেশে হাজার হাজার গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য হল লক্ষ লক্ষ মহিলা যারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেতে অনুপযুক্ত বিবেচিত হত, তাদেরকে ঋণ গ্রহণের

উপযুক্ত বিবেচনা করে কোন রকম বন্ধক ছাড়াই ঋণ দেয়া এই ঋণ দানে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সংগঠিত করার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করছে। গ্রামীণ ব্যাংকরে প্রতিষ্ঠাতা ডঃ ইউনুসের বিখ্যাত উক্ত, 'মানুষ ব্যাংকের কাছে যাবে না বরং ব্যাংকই মানুষের কাছে যাবে' খুবই প্রণীধান যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে এ উক্তিরই প্রতিফলন দেখছি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে । ডঃ ইউনুস বলেন, 'আমরা ঠিক করেছি মানুষ আমাদের ব্যাংকে ঋণের জন্য আসবে না, আমাদের ব্যাংক যাবে' মানুষের কাছে ঋণ দেয়ার জন্যে। গ্রামীণ ব্যাংকের ১৪ হাজার কর্মী আছে। এর মধ্যে ১১ হাজার কর্মী কাজ করছে থানা পর্যায়ে। এই ১১ হাজার কর্মীকে সপ্তাহে একবার সাক্ষাত করতে হয় গ্রামীণ ব্যাংকের ২৪ লাখ ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে। সমস্ত লেন-দেন হয় ঋণ গ্রহীতার বাড়ির সামনে (ইউনুস ১৯৯৮)।

ক্ষুদ্র ঋণেণ মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা যারা দুঃস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা স্বউপার্জিত কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে। এই সকল মহিলারা বিভিন্ন উৎপাদন কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছে, বাজারে যাচ্ছে, নিজের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করছে। পরিবারে তাদের ভূমিকা পরিবর্তন হয়েছে, স্বামী, ও সমাজ তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে। আরও বলা হচ্ছে যেহেতু মহিলারা আয় করছে তাই পরিবারে তাদের প্রভাব বেড়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সাথে পরামর্শ করা হয়। সার্বিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের বর্তমান এই অবস্হাকেই বলা হচ্ছে যে, ক্ষমতায়ন, মহিলারা 'ক্ষমতায়িত হচ্ছেন' ইত্যাদি ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তরা আরও বলছেন যে এই ঋণ দারিদ্র বিমোচনে সমূহ অবদান যোগাবে। যদিও দারিদ্র বিমোচন স্বল্প মেয়াদী ব্যাপার নয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পূণাঙ্গ পরিকল্পনা। কিন্তু যুক্তি দেখানো হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ যেহেতু দ্ররিদ্র ভূমিহীন ও দুস্হ জনগোষ্ঠীর জন্যে তাই এ ঋণ দ্রুত না হলেও ধীরে ধীরে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখবে। ক্ষুদ্র ঋণের অন্যতম প্রবক্তা ডঃ ইউনুস, তার একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাতে বলেছেন, 'আমি দারিদ্র নিরসনের কথা বলছি না, বলছি দুষ্ট চক্র ভাঙ্গার কথা, সে ক্ষেত্রে সফলতা এক'শ ভাগ। মানুষের এখন সঞ্চয় বেড়েছে আয় বেড়েছে, দুষ্ট চক্র থেকে সে এখন বেড়িয়ে আসছে (ইউনুস ১৯৯৮)। এই বক্তব্য থেকেই এটাই স্পষ্ট যে দারিদ্রতা বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের বর্তমান সাফল্য সীমিত হলেও সদূর প্রসারী।

গ্রামের দুঃস্হ জনগোষ্ঠীর অবস্হা উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ নিঃসন্দেহে একটি অন্যতম সংযোজন। কিন্তু ক্ষুদ্র ঋণ যে জন অধ্যুষিত গরীব দেশগুলোতে দারিদ্র বিমোচনে একক ভূমিকা পালন করছে তা ভাবা ঠিক নয়। বিশ্ব ব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর 'জনপ্রিয়তা' ও বিভিন্ন দেশে এর বিস্তার কোন ভাবেই এর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশ করে না। প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে দাতা সংস্হা ও দেশগুলোর (বিশেষ করে বিশ্ব ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্র) অনুদান ও অনুপ্রেরণা। ক্ষুদ্র ঋণে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ১৯৯৬ সালে

ওয়াশিংটনে হয়েছিল 'মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলন'। বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এ্যাসিষ্ট দ্যা পুওর (সিজিপি) নামে একটি ফোরাম। এই ফোরামের বাজেট হল ৫০ কোটি টাকা। বিশ্বের ২৭টি দেশ ও প্রতিষ্ঠান এই ফোরামের সদস্য। এই ফোরামের তহবিল বর্তমানে ৫০০ মিলিয়ন ডলার। ইতিমধ্যে ফোরামের তহবিল ব্যায়ের প্রশ্নে প্রশ্ন উঠেছে। ক্ষুদ্র ঋণের অন্যতম প্রবক্তা ডঃ ইউনুস বলেছেন, 'এই ফোরামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আবার ক্রিটিকাল।' এরা যাকে মাইক্রো ক্রেডিট পোগ্রাম বলছে আমি সেটাকে মাইক্রো ক্রেডিট বলতে রাজী নই। ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশীর ভাগ এরা খরচ কর ফেলছে কনসালটেসিতে' (পূর্বোক্ত)।

সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পারিবারিক কলহ বেড়েছে, ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে টেনশন ও দ্বন্দ্ব বেড়েছে, গ্রুপগুলোতে জ্ঞাতি সম্পর্কের অংশগ্রহণকারীরাই ঋণ দেয়া ও নেয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে এবং ঋণ আদায়ে যে চাপ দেয়া হচ্ছে তাকে অনেকেই 'বাড়াবাড়ি' হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

পত্র পত্রিকায় এখনও খবর আসছে যে ঋণের কিস্তি না দিতে পারার কারণে ঋণ গ্রহীতার ঘরের টিনের চাল খুলে নেয়া হয়েছে, গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী নিয়েছে এমন কি পুলিশের মাধ্যমে হয়রানীর ও খবরও পাওয়া যাচ্ছে। এটাও বলা হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। কেউ কেউ এমনও যুক্তি দেখাচ্ছেন যে এনজিও অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাম এলাকায় নব্য মহাজন হিসেবে আর্ভিভূত হয়েছে যা কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। গত ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ প্রথম আলো পত্রিকার এক খবরে বলা হয় যে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের (এনজিও) ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৭ জন মহিলা সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়া সম্প্রতি (ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৯৯) সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় জৈনক মন্ত্রী বলেছেন, 'যে দেশে কোন কোন এনজিও'র ঋণের সুদের হার বেশী এবং ঋণ আদায়ে জোরজবরদস্তির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করলে অনেক সময় দাতাগোষ্ঠরি দিক থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

মহিলারা যে ঘর থেকে বড় হয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এটাকে অনেকে 'ইসলাম বিরোধী' কাজ বলে আখ্যায়িত করছেন। এখানে অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে স্থানীয় সিভিল সমাজের যোগাযোগ ভাল নয়। এতে এদের কর্মকান্ড নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্বাস , ভুল বুঝাবুঝি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ । আরও একটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তাহলো ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচীর প্রধান ফোকাস মহিলা কেন হবে? ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান যদিও পুরুষদের অংশ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে না কিন্তু, তারা তুলনামুলক ভাবে মহিলাদের বেশী উৎসাহ দেন। এটা অনেকে ভাল চোখে দেখেন না, মৌলবাদীরা বলেন এটা

'পুরুষ বিদ্বেষী' আর সমাজপতিরা বলেন মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে 'পরিবার ও ঘর ভাঙ্গার' পায়তারা চলছে। ঋণে ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও মহিলারা ঋণ নিচ্ছে কিন্তু এটি বাবহার করছে পরিবারের পুরুষরা। তারাই ঠিক করছে ঋণের কি ব্যবহার হবে, কোথায় হবে এবং ঋণের কিস্তি কিভাবে পরিশোধ করতে হবে। তাই বলা হয় যদিও মহিলার নামে ঋণ দেয়া হয় পুরুষরাই এর ব্যবহারকারী, তাই পুরুষদের ঋণ দিতে বাধা কোথায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষ্যে হল তাত্ত্বিক বিবেচনায় যদিও ক্ষুদ্র ঋণের টার্গেট গ্রুপের বিরাট একটি অংশ হল মোটামোটি স্বচ্ছল এমন জনগোষ্ঠী । তাই বলা হচ্ছে টার্গেটের দিক থেকেও ক্ষুদ্রঋণ প্রকৃত গরীবদের কাছে পৌছতে পারছে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে ক্ষুদ্র ঋণের দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দমতায়ন বিষয়টি নিয়ে বহু ধরণের সমালোচনা হচ্ছে ও প্রশ্ন উঠেছে যা যথাযথ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। এ সকল সমালোচনা ও প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষ গবেষকের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে উদঘাটিত করতে হবে। তাই বলব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষমতায়ন ধারনাটি একমাত্রিক নয় বরং বহুমাত্রিক। ক্ষমতায়ন বুঝতে হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ও সম্পর্কগুলো নিবিড়ভাবে অনুধাবন করতে হবে।

সম্প্রতি আমিনুর রহমান নামে একজন নৃবিজ্ঞানী টাঙ্গাইলের একটি গ্রামে এক বৎসর যাবত গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন (আলম ১৯৯৯)। তিনি তার গবেষণা লেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে যদিও মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তথাপি এর প্রভাব কতটুকু স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী হবে এ নিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মহিলাদের দেয়া ঋণের ৬০% পরিবারের পুরুষরা ব্যবহার করে। এর মধ্যে ৭৮% ঋণ ব্যাংকের অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা হয়। রহমান তার গবেষণায় পেয়েছেন যে ৩০% ঋণ পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন যেমন, যৌতুক দেয়া, ঔষধ কেনা, বিদেশে যাওয়ার খরচ বহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়। এই ঋণ কার্যক্রমের ফলে পরিবারে দ্বন্ধ কলহ ও মহিলাদের উপর নির্যাতন বেড়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি আরও দেখান যে লোন সেন্টার গুলোতে প্রভাবশালী ঋণ গ্রহীতারই ক্ষমতাবাদ। ঋণ বিতরনে প্রভাবশালী সদস্যদের জ্ঞাতিরা বেশী অগ্রাধিকার পায়। তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখান যে লোন সেন্টারের কথাকাটিকাটি পরবর্তী পর্যায়ে আন্ত-পরিবার কলহে রূপান্তরিত হয়। রহমান আরও যুক্তি দেখান যে ঋণ বিতরণে মহিলারা অগ্রাধিকার পান তাদের অবস্থাগত নাজুকতার (positional vulnerability) কারণে (Rahman 1998)। মহিলারা লাজুক, বিনয়ী এবং (submissive) তাই ঋণ দিয়ে সহজেই তাদের উপর বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে তা আদায় সম্ভব।

একটি গ্রামের গবেষণা থেকে পাওয়া আমিনুর রহমানের এই তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যথাযথ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। তবে আমি একটি বিষয় জোর

দিয়ে বলতে চাই যে যদিও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় কিন্তু কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কার্যক্রম বা মডেলের পরিবর্তন আনতে হবে। কোন একটি মডেল চিরস্থায়ী বা অনড় নয় তা সে যতই প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হউক না কেন। এটাও ভুললে চলবে না যে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া কিংবা 'দারিদ্র বিমোচন' একটি কাঠামোগত সমস্যা এবং এই আলোকে প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে।

স্থানীয় পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে মহিলাদের ক্ষমতায়নে আরেকটি বহু প্রচারিত পদক্ষেপ হল ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলাদের অংশগ্রহণ। ইউনি.যন পরিষদে মহিলাদের জন্যে ৩টি সিট নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সিটে কেবলমাত্র মহিলারাই নির্বাচিত করা হয়। বিভিন্ন প্রাচার মাধ্যম, রাজনীতিবিদ এনজিও নেতৃবৃন্দ এ ব্যবস্থাকে মহিলাদের ক্ষমতায়নে একটি 'ঐতিহাসিক' যুগান্তকারী' পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তবে এর মাধ্যমে মহিলারা ক্ষমতায়িত হয়েছেন কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সিট সংরক্ষিত করে মহিলাদের নির্বাচিত করলেই কি ক্ষমতায়ন হয়ে যায়?

আমি প্রবন্ধে কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে ক্ষমতায়ন বিষয়টি বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। ক্ষমতায় ধারণাটি যেহেতু কাঠামোগত ও বিদ্যমান সমাজের কতগুলো সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই 'কাঠামোগত' ও অন্যান্য সম্পর্কগুলো পরিবর্তিত রেখে ক্ষমতায়ন কতটুকু কার্যকরী তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে । বুঝতে হবে যে আমাদের সমাজ এখনও পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ শাষিত। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সমাজ কাঠাসমোর বিভিন্ন সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করছে। ইউনিয় পরিষদের সদস্যদের যেখানে তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ, সেখানে তিনজন মহিলা সদস্য কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে তা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায় বহু খবর বেড়িয়েছে যে মহিলা সদস্যরা তাদের কর্তব্য সম্পাদনে পুরুষ সদস্য ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় সহযোগীতার অভাবে যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না।

উপসংহার

এ প্রবন্ধে যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে সাম্প্রতিকালে ক্ষমতায়ন মূলধারা উন্নয়ন ডিসকোর্সের একটি অন্যতম রিটোরিক। উন্নয়ন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে যখনই উন্নয়ন ধারণাটির প্রভাব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এখন উন্নয়ন প্রবক্তরা নতুন শব্দ সংযোগ করে এটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী বাঞ্চিত পরিবর্তন সম্ভব

নয় যদিনা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিদ্যমান সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়। ক্ষমতায়ন শব্দটির মধ্যে দেয়া-নেয়া, উঁচু-নীচু, একটি অসম সম্পর্কের ধারণা গ্রোথিত রয়েছে।

কে কাকে ক্ষমতায়িত করছে এটা মৌলিক প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বা আলোচনা আমরা কোথাও পাইনে । আমি প্রবন্ধে কোথাও বলিনি যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ক্ষমতায়নের জন্যে যে সকল কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, আমি কেবল বলেছি বিষয়টিকে আরও কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়। এজন্যে সাধারণ মানুষের ক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং এ আস্থা স্থাপনের পূর্বে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে এবং এই অবস্থমায় যে সকল উপাদানগুলো বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলোকে নিরপেক্ষ করে ফেলতে হবে।

এ প্রবন্ধে আরও যে বিষয়টিকে জোড় দেয়া হয়েছে তা হল সমাজের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে কিছু অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিংবা ঋণ প্রকল্প গ্রহণ করলেই ক্ষমতায়ন কায়েম হবে না। এটা সাময়িক কিছু পজেটিভ পরিবর্তন আনলেও এর সূদূর প্রসারী প্রভাব খুবই স্বল্প ও সীমাবদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সার্বিক ক্ষমতায়নের একটি পদক্ষেপ বা পর্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। বর্তমান প্রেক্ষিতে ক্ষমতায়ন ধারণাটি এখনও অস্পষ্ট।

তথ্যসূত্র

আলম, এস, এম, নুরুল (১৯৯৯) উন্নয়ন থেকে উত্তর-উন্নয়ন, *সমাজ নিরীক্ষণ* (প্রকাশিতব্য)

ইউনুস, ডঃ মুহাম্মদ (১৯৯৮) জবাবদিহিতা (সাক্ষাতকার), *জনকণ্ঠ*, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯৮।

CDF (1997) *CDF Statistics (Micro-Finance Statistics of NGOs and other MFIs)*, Vol. 5, December 1997

Freire, P. (1972) *Pedagogy of the Oppressed.* London.

Griffin, K. and A. R. Khan (1982) Poverty in the Third World: Ugly Facts and Fancy Models. In H. Alavi and T. Shanin, ed., *Introduction to the Sociology of Developing societies*, New York: Monthly Review Press, pp.236-251

Hashemi, S. M., S. R. Schuler and A. P. Riley (1996) Rural Credit Programmes and Women's Empowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4):35-53

Menike, K. (1993) People's Empowerment form the People's Perspectives. *Development in Practice*, August, pp.76-183

Rahman, A. (1998) Micro-Credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays? *World Development*, 26(12).

Ruttan, V. W. (1986) Cultural Endowments and Economic Development: What Can We Learn from Anthropology? *Economic Development and Cultural Change*, 36:247-266.